LEARN GEETA
तस्मात् योगी भवार्जुन

॥ श्रीहरि ॥
বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দেজগদ্গুরুম্।।

॥ गीता पढ़ें, पढ़ायें, जीवन में लायें ॥

|| শ্রীমদ্ভগবদগীতা বিবেচন সারসংক্ষেপ ||

অধ্যায় 14: গুণত্রয়বিভাগযোগ

1/2 (শ্লোক 1-6), শনিবার, 27 জুলাই 2024

ব্যাখ্যাকার: গীতা প্রবীণ মাননীয়া কবিতা বর্মা মহাশয়া

ইউটিউব লিঙ্ক: https://youtu.be/MW6PEATFDnE

ত্রিগুণ যা আমাদের সংসারে আবদ্ধ করে রাখে

ভগবদ্গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ের নাম **গুনাত্রয়-বিভাগ-যোগ।** অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই অধ্যায়ে তিনটি গুণের শ্রেণীবিভাগ এবং তাদের বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বিবেচন সন্ধ্যার আরম্ভ হয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, মা সরস্বতী ওর পরম গুরু বেদব্যাসর সুন্দর বন্দনা এবং শুভ দীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে।

ভগবদ্গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে এই বিশ্বসংসারে ঘটিত সমস্ত ক্রিয়াকলাপের মৌলিক কারণ হচ্ছে তিনটি গুণ।

- **সাত্ত্বিক** - যা ধার্মিকতা ও উদারতা প্রদান করে
- **রাজসিক** - যা সংযুক্তি এবং বিষাদ প্রদান করে এবং
- **তামসিক** - যা অজ্ঞতা এবং জড়তা প্রদান করে

ভারতীয় দর্শনে গুণের বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ছয়টি প্রধান হিন্দু দর্শনেই অর্থাৎ, বৈশেষিক, সাংখ্য যোগ, পতঞ্জলি, ন্যায়, পূর্বমীমাংসা এবং উত্তরমীমাংশায় এটির বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়।

সংস্কৃত ভাষায় গুণ শব্দের মানে দড়ি যা দুটি জিনিসকে একে অপরের সাথে বেঁধে রাখে। তেমনি এই দড়িটি জীবকে সংসারের সাথে বেঁধে রাখে।

এই অধ্যায়ে সৃষ্টিতে গুণের মৌলিক গুরুত্ব এবং তার কর্মের ওপর প্রভাব সম্পর্কে বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

14.1

শ্রীভগবানুবাচ

পরং(ম্) ভূয়ঃ(ফ্) প্রবক্ষ্যামি, জ্ঞানানাং(ঞ) জ্ঞানমুত্তমম্
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ(স্) সর্বে, পরাং(ম্) সিদ্ধিমিতো গতাঃ॥1॥

শ্রীভগবান বললেন - আমি আবারও বলবো সকল জ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (এবং) সর্বোত্তম জ্ঞান, যা জেনে সমস্ত ঋষিরা এই জগৎ থেকে পরম সিদ্ধি লাভ করেছেন (ক্ত)।

ভগবান অর্জুনের কাছে বারংবার পরম জ্ঞানের উল্লেখ এবং ব্যাখ্যা করেছেন। এই পুনরাবৃত্তির কারণ ভগবান বলেছেন যে যেহেতু এটি সর্বোত্তম জ্ঞান, এটি বোঝা এবং নিজের জীবনে তা গভীর ভাবে প্রয়োগ করা খুব সহজ নয়। সেহেতু এটির পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন।

প্রথম অধ্যায়ের ঊনত্রিশ এবং তিরিশতম শ্লোকে আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের মনের অবস্থার একটি আভাস পাই। তিনি সেখানে বলেছেন যে তিনি দুর্বল এবং অস্থির বোধ করছেন, তার মুখের ভেতর শুকিয়ে আসছে, তার সারা শরীর কাঁপছে, ভয়ে তার চুল দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এমনকি তিনি তার ধনুক গান্ডীবকেও সঠিকভাবে ধরে রাখতে পারছেন না। তার মন দ্বিধাগ্রস্ত এবং বিভ্রান্ত। তিনি মানসিক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছেন এবং আর নিজেকে স্থির রাখতে পারছেন না।

সীদন্তি মম গাত্রাণী, মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি।
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে॥29॥
গাণ্ডীবং(ম্) স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্‌চৈব পরিদহ্যতে।
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ॥30॥

এমত মনের অবস্থায়, এটা স্বাভাবিক যে, অর্জুন এমত গূঢ় তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে এবং বুঝতে সক্ষম হবেন না। এই কারণে ভগবানকে অর্জুনের কাছে বারবার এই উপদেশ পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে।

ঈশ্বর আমাদের সেই মায়ের মতো যিনি তার শিশু সন্তানের অনিচ্ছা এবং খেতে অস্বীকার করা সত্ত্বেও জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। এর কারণ, একজন মা হিসেবে, তিনিই জানেন তার সন্তানের কতটা খাবার প্রয়োজন। তার সন্তানের কি দরকার এবং তার জন্য কি কল্যাণ কারক, তা সেই মায়ের চেয়ে হয়তো কেউ বেশি জানেন না।

একইভাবে, ভগবান জানেন যে অর্জুনকে এই গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানটি বারবার শুনতে হবে যাতে তিনি সেটিকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারেন এবং তার বর্তমান মানসিক বিভ্রমবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন।

ভগবদ্গীতার আসল উপদেশের সারমর্ম গ্রন্থটির প্রথম তিনটি অধ্যায়ের মধ্যেই সম্পূর্ণ হয় যায়। চতুর্থ, নবম এবং অষ্টাদশ অধ্যায় এই তিনটি অধ্যায়ের সারাংশ।

ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে গীতা হল "জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্" অর্থাৎ এটি সর্বোত্তম জ্ঞান। এই সেই পরমেশ্বরের ব্রহ্ম জ্ঞান যা কখনও ধ্বংস হয় না।

স্কুল বা কলেজে পাওয়া শিক্ষা কেবল কিছু বছর মনে রাখা যায়। দীর্ঘ সময়ের জন্য মনে রাখতে হলে, আমাদের নিয়মিত পাঠ কণ্ঠস্থ করতে হবে। একইভাবে, ভগবদ্গীতা নিত্যদিন পাঠ মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা উন্মোচন হতে সাহায্য করে। ভগবান এও বলেন যে এই পরম জ্ঞান মুনি ঋষিদের পরম সিদ্ধি লাভ করতে সাহায্য করেছে ।

অর্জুন ভগবানের কাছে জানতে চান যে যারা তাদের আধ্যাত্মিক যাত্রা এই জন্মে সম্পূর্ণ করতে পারেননি, তাদের কি পরবর্তী জন্মে আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হবে। এর উত্তরে পরমাত্মা বলেন যে, পরবর্তী জন্মে মানুষ তার আধ্যাত্মিক যাত্রা সেই ক্ষণ থেকে শুরু করতে পারেন যেখানে তিনি পূর্বজন্মে সমাপ্ত করেছিলেন।

14.2

পরমেশ্বর আশ্বাস দেন যে যখন কেউ এই সর্বোত্তম জ্ঞান লাভ করেন এবং তা পূর্ণভাবে নিজের জীবনে নিয়ে আসতে সক্ষম হন, তখন সে পরমাত্মার মধ্যে আত্তীভূত হয়ে এক হয়ে যান।

এই জ্ঞান লাভের পর সাধক "অহম্ ব্রহ্মাস্মি"-এর প্রকৃত উপলব্ধি লাভ করেন। প্রভুর সাথে এই মিলনের হেতু, সেই ব্যক্তি জন্ম-মৃত্যুর এই অমোঘ চক্র থেকে মুক্তি পায়ে এবং প্রলয়ের শেষে, সৃষ্টির শুরুতে তাকে আর এই নশ্বর পৃথিবীতে পুনর্জন্মগ্রহণ করতে হয় না।

আমাদের ভারতীয় প্রথা অনুসারে, যখন একটি শিশুর নামকরণ অনুষ্ঠান হয়, সেই সময়, পুরোহিত শিশুটির কানে তার প্রদত্ত নামটি বলার আগে জিজ্ঞেস করেন, "কহম কুথা আয়থা?" ('আমি কে? আমি কোথা হতে এসেছি?)। এই আচারের কারণ, এই পৃথিবীতে মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। সেই শিশু যার নামকরণ হচ্ছে, সে আসলে ঈশ্বরের অংশ এবং এই জাগতিক পৃথিবীতে তার জীবনকাল শেষ হলে সে আবার সেই ঈশ্বরের সত্তায় ফিরে যাবে।

হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্বে, মহাবিশ্বের সৃষ্টি এবং ধ্বংসের এই অন্তহীন চক্রে চার ধরণের প্রলয়ের কথা বলা আছে - নিত্যপ্রলয়, নৈমিত্তিকপ্রলয়, প্রকৃতিপ্রলয় এবং অত্যন্তিকপ্রলয়

নিত্যপ্রলয় - আমাদের প্রতিদিনের ঘুমকে বোঝায়। আমাদের ঘুমের তিনটি পর্যায় রয়েছে

- **জাগ্রত অবস্থা** - সচেতন অবস্থা যখন আমরা নিশ্চল থাকি কিন্তু আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মন সতর্ক থাকে।
- **স্বপ্নঅবস্থা** - যখন আমরা নিশ্চল, আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয়, কিন্তু আমাদের মন সজাগ থাকে।
- **সুষুপ্তি অবস্থা** - গভীর ঘুমের অবস্থা যখন আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মন সমস্ত সুপ্ত হয়ে পরে। বলা হয়ে এই অবস্থায়, আমরা আমাদের নিজস্ব স্বরূপ কে উপলব্ধি করতে পারি এবং ঈশ্বরের সাথে একাত্ম হই যাই। জেগে উঠলে আমরা আমাদের দৈনন্দিন পার্থিব জীবনে ফিরে আসি। এর কারণ হলো, সুষুপ্তি বা গভীর ঘুমের অবস্থাতেও, আমরা আমাদের চিত্তবৃত্তির (মনের অনুরক্তি ও আসক্তি) সাথে যুক্ত থাকি। এই সংযুক্তি আমাদের জাগ্রত হওয়ার পরে আবার জাগতিক জীবনে টেনে নিয়ে যায়।

চেতনার এই তিনটি যা আমরা প্রতিদিন অনুভব করি, স্তরের বাইরে আরো একটি চতুর্থ অবস্থা রয়েছে যাকে **তুরিয়া অবস্থা** বলা হয়। এই অবস্থায় সমস্ত চিত্তবৃত্তি অর্থাৎ মনের
সমস্ত কামনা, বাসনা, আসক্তি ধ্বংস হয়ে যায় এবং সেই ব্যক্তি পরমাত্মার সাথে মিলন লাভ করে। এই অবস্থা থেকে আর কাউকে ফিরে আসতে হয়না। তবে এটি একটি সাধারণ
অবস্থা নয় এবং শুধুমাত্র পরম জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই এই অবস্থায় পৌঁছনো যায়।

নৈমিত্তিকপ্রলয় ঘটে যখন ত্রৈলোক্য অর্থাৎ তিনটি লোকের (স্বর্গ, ভুলোক এবং নরক) বিনাশ ও বিলুপ্তি হয়। একে ত্রিলোক্য বিনাশনাম বলা হয়। প্রকৃতি প্রলয় ঘটে যখন এই মহাবিশ্বের প্রতিটি জড় বস্তুর বিলুপ্তি হয়। প্রাকৃতিক প্রলয়ের সময়ে প্রকৃতি নিজেই প্রকৃতির মধ্যে বিলীন হয় যায়। অবশিষ্ট থাকে কেবল মুলতত্ত্ব।

অত্যন্তিক প্রলয় বলতে মোক্ষ বা পরম মুক্তিকে বোঝানো হয় যখন এক নশ্বর সত্তা জন্ম-মৃত্যুর মহাকাল চক্র থেকে মুক্তি অর্জন করে। মোক্ষ বা তুরিয়া অবস্থা শুধুমাত্র "নির্বিকল্প সমাধির" মাধ্যমে অনুভব করা যায়, এবং সাধারণ মানুষ তা অনুভব করতে পারে না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, যে সাধক এই পরম জ্ঞানকে উপলব্ধি করেন, সেই সাধক যিনি যজ্ঞ করেন থেকে শ্রেষ্ঠ এবং তারা এই প্রলয়কাল দ্বারা প্রভাবিত হন না। যে সাধক যজ্ঞ করেন, তিনি হয়তো স্বর্গে পৌঁছতে পারেন, কিন্তু স্বর্গের অপার আনন্দ উপভোগ করার পরে, যখন পূর্বজীবনে অর্জিত পুণ্যগুলি নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন মানুষ আবার নশ্বর

জগতের জন্মমৃত্যুর চক্রে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

নবম অধ্যায়ের একুশতম শ্লোকে ভগবান ত্রিলোকের অস্থায়ী প্রকৃতির ব্যাখ্যা করেছেন

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে।

পরম জ্ঞান একজন ব্যক্তিকে মোক্ষের দিকে নিয়ে যায় এবং জন্মমৃত্যুর অন্তহীন চক্র থেকে মুক্ত করে। তখনই সে চিরন্তন সিদ্ধি ও সুখে জীবনে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। হিমালয়ে বসে যে ঋষিরা তপস্যা করেন, তারা অন্তঃকরণ সর্বদা প্রসন্ন থাকে এবং কারও কাছ থেকে কোনো প্রত্যাশা রাখেন না।

14.3

ইদং(ঞ) জ্ঞানমুপাশ্রিত্য, মম সাধর্ম্যমাগতাঃ
সর্গেপি নোপজায়ন্তে, প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥2॥

এই জ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে যারা আমার ধার্মিকতা লাভ করেছে, (তারা) মহাকল্পেও জন্ম নেয় না এবং মহাপ্রলয়েও দুঃখ পায় না।

সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতি (সমস্ত সৃষ্টির উৎস, মূল কারণ) এবং পুরুষের (সৃষ্টির শক্তি, চেতনা) ব্যাখ্যা আছে। প্রকৃতি হলো সৃষ্টির গর্ভ এবং পুরুষ সৃষ্টির বীজ প্রদানকারী।

প্রকৃতি হল একটি বৈদ্যুতিক পাখার দেহের মতো, আর পুরুষ হল সেই বিদ্যুৎ যা পাখাটিকে চালায়। যেমন বিদ্যুৎ ছাড়া পাখা বাতাস উৎপন্ন করতে অক্ষম, ঠিক তেমনি পাখা না থাকলে বিদ্যুৎ একা সেই বাতাস উৎপন্ন করতে পারবেনা| বিশ্বব্রহ্মান্ডে তেমনি পুরুষের সাহায্য ছাড়া প্রকৃতি সৃষ্টি করতে অক্ষম এবং প্রকৃতি ছাড়া পুরুষও সৃজন করতে অক্ষম। কোনো সৃষ্টি সম্পাদনের জন্য দুজনেরই অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতির প্রয়োজন।

ভগবান বলেছেন মহাজগৎ হল গর্ভ এবং তিঁনি নিজে সৃষ্টির জন্য সেই গর্ভে বীজ প্রদান করেন।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে সৃষ্টির বিন্যাসক্রম সম্বন্ধে বলা আছে **তস্মাদ্ব্বা এতস্মাদাত্মনা আকাশঃ সম্ভূতঃ।**

আত্মা হল সর্বোচ্চ সত্তা, এবং তাকে আকাশ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই কারণেই আকাশকে প্রায়শই জীবাত্মার উপমা হিসাবে ব্যবহৃত করা হয় কারণ আকাশ এবং আত্মা , দুটোই সর্বব্যাপী কিন্তু অদৃশ্য।

- আকাশ থেকে বায়ু আসে এবং
- বায়ু থেকে আসে অগ্নি
- অগ্নি জলের জন্ম দেয় এবং শেষে
- জল থেকে পৃথিবী তৈরী হয়। কোনো পদার্থপূর্ণ এবং ঘ্রানযুক্ত বস্তুকে পৃথিবী বলে বিবেচনা করা হয়।

ভগবান বলেছেন যে তিনি এই পৃথিবীতে সমস্ত কিছু এবং সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টি কর্তা । "কোহম" অর্থাৎ 'আমি কে?' এবং পরমাত্মার সাথে আমাদের সম্পর্ক, বুঝতে হলে, আমাদের ধ্বংসাত্মক সৃষ্টির প্রকরণ বুঝতে হবে।

শঙ্কর ভাষ্যম অনুসারে, অদ্বৈত সিদ্ধান্ত দর্শন অনুসারে, একটি মাত্র ব্রাহ্মণ বিদ্যমান। তাঁর কোন দ্বৈততা নেই। আত্মা একক, এবং তাঁর কখনো সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না। সে অবিনশ্বর, অপরিবর্তনশীল সর্বশ্রেষ্ঠ।

ভগবান অর্জুনের মাধ্যমে বিশ্বকে এই পরম জ্ঞান প্রদান করছেন। আমরা যদি মনে করি যে আমরা গীতা শিখে এবং মুখস্থ বা পাঠ করে এই পরম জ্ঞান অর্জন করেছি, তা আমরা ভুল হবে। কেবলমাত্র গীতায় প্রদত্ত জ্ঞানকে নিজেদের

জীবনে ধারণ করলে, আমরা হয়তো বলতে পারি যে আমরা গীতার সারমর্ম বুঝতে শুরু করেছি, যদিও গীতার সম্পূর্ণ অমৃতকথা বোঝার জন্য চাই অনুশীলন, ধৈর্য এবং নিরহঙ্কারতা। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে গীতার এই উপদেশ বাস্তবায়ন করতে পারলে আমরা মোক্ষ লাভের পথে চলা শুরু করতে পারি।

14.4

মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম , তস্মিন্ গর্ভং(ন্) দধাম্যহম্
সম্ভবঃ(স্) সর্বভূতানাং(ন্), ততো ভবতি ভারত॥3॥

হে ভারতবংশোদ্ভব অর্জুন! আমার আদি প্রকৃতিই উৎপত্তিস্থল (এবং) আমি এতে আত্মার গর্ভ স্থাপন করি। তা থেকে সমস্ত প্রাণীর জন্ম হয়।

বিশ্বের চুরাশি লক্ষ বা ততোধিক প্রাণীর সৃষ্টির অন্তর্নিহিত নীতি একই; সমস্ত সৃষ্টিতে যোগেশ্বর হচ্ছেন পিতা এবং প্রকৃতি হচ্ছেন মাতা।

বিশ্বের সমস্ত সৃষ্টিকে তাদের জন্ম প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায়:

- **আন্দাজ:** ডিম থেকে যাদের উৎপত্তি, যেমন সরীসৃপ, পাখি।
- **পিন্ডজ বা জরায়ুজ:** মানুষ এবং অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর মতো যারা মায়ের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করে।
- **স্বেদজ:** যারা ঘাম, মলমূত্র থেকে জন্মগ্রহণ করে, যেমন জীবাণু।
- **উদ্ভিজ:** যাদের মাটি থেকে বীজ অংকুরিত হয়ে জন্ম হয়, যেমন গাছপালা।

এই সমস্ত জীবরূপের উৎপত্তি প্রক্রিয়ায়, ঈশ্বরই প্রকৃতিকে জীবন ও শক্তি প্রদান করেন যাতে প্রকৃতি সেই জীবকে উৎপন্ন করতে সক্ষম হন।

এই শ্লোকটি পরমাত্মার ওপরাশক্তির একটি ধারণা দেয়। তিঁনি এই পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ প্রজাতির স্রষ্টা, এবং আশ্চর্যের বিষয় হলো যে এই পৃথিবীর প্রতিটি গাছের প্রতিটি পাতা অনন্য এবং একের মতো আর একটি কোনও পাতা নেই। একইভাবে, পৃথিবীর দুটি প্রাণী বা দুটি মানুষ এক রকম নয়। পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী তার নিজস্ব ভাবে অনন্য।

এটাই ঈশ্বরের পরম সৃজনশীল শক্তি।

14.5

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় , মূর্তয়ঃ(স্) সম্ভবন্তি যাঃ
তাসাং(ম্) ব্রহ্ম মহদ্যোনিঃ(র্), অহং(ম্) বীজপ্রদঃ(ফ্) পিতা॥4॥

হে কুন্তীনন্দন! সমস্ত প্রাণীর মধ্যে যে সমস্ত দেহের জন্ম হয় তার আদি প্রকৃতি হল মাতা (এবং) আমিই পিতা যিনি বীজ স্থাপন করেন।

এই অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোক থেকে ভগবান তিনটি গুণ এবং তাদের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। আমাদের মধ্যে গুণের উপস্থিতিই, আমাদেরকে এই পার্থিব জগতের সাথে বেঁধে রাখার জন্য দায়ী।

প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে তিনটি গুণ (সহজাত প্রবণতা বা চরিত্র) দেখা যায়। সেই তিনটি গুণ হলো সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক। এই গুণগুলি মানুষের মধ্যে প্রকৃতি থেকে আসে এবং তা মানুষের মনকে প্রভাবিত কোরে তার মধ্যে নানা

রকম ইচ্ছা, আসক্তি এবং আচরণকে উৎপন্ন করে।

ঠিক যেমন তিনটি প্রাথমিক রং অর্থাৎ লাল, সবুজ এবং নীলকে বিভিন্ন পরিমাণের মিশ্রণ করে লক্ষ লক্ষ রং তৈরি করা যায়, তেমনি এই তিনটি গুণের সংমিশ্রণে মানুষের নানা
রকম প্রকৃতি, প্রবণতা ও আচরণ তৈরী হয়।

এই গুণগুলি শিকলের মতো আমাদেরকে এই জগতে বেঁধে রাখে। গুণই আমাদেরকে আমাদের নশ্বর দেহ, আমাদের পরিস্থিতি এবং সংসারের প্রতি আসক্ত করে রাখে এবং জাগতিক পৃথিবীর সাথে বেঁধে রাখে। এই বন্ধনই আমাদের বেদনা এবং দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়ে।

এই সম্পর্ক বা বন্ধনগুলি আমরা পূর্বজন্ম থেকে বর্তমান, এমনকি পরবর্তীজন্মেও নিয়ে যাই। যেমন আমরা পূর্বজন্মের বন্ধু হয়তো বর্তমান জন্মে আমরা শত্রু হতে পারে। এই বন্ধন বা আসক্তিগুলি কিন্তু শুধুমাত্র আমাদের নশ্বর সত্তার সাথে সংযুক্ত, কারণ আমাদের আত্মা হলো চিরন্তন এবং অনাসক্ত।

ভগবান এর পর সেই লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যগুলির ব্যাখ্যা দেবেন যার দ্বারা আমরা আমাদের মধ্যে উপস্থিত গুণগুলিকে সনাক্ত করতে পারি।

পরবর্তী শ্লোকে তিঁনি সাত্ত্বিক গুণাবলীর বর্ণনা দিয়ে শুরু করেন।

14.6

সত্ত্বং(ম্) রজস্তম ইতি, গুণাঃ(ফ্) প্রকৃতিসম্ভবাঃ
নিবধ্নন্তি মহাবাহো, দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥5॥

হে মহান যোদ্ধা! সত্ত্ব, রজ (এবং) তম প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত - এই (তিন) গুণগুলি অবিনশ্বর আত্মা।(জীবাত্মা) দেহে।

এই শ্লোক থেকে ঈশ্বর তিনটি গুণের বৈশিষ্ট এবং তাদের সনাক্ত করার লক্ষণগুলির ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেছেন।

ভগবান বলছেন যে এই সমস্ত গুণ, শিকলের মত যা আমাদেরকে জগতের সাথে সংযুক্ত করে রাখে। তামসিক গুণ একটি লোহার শিকলের মতো, রাজসিক গুণ রুপার
শিকলের মতো এবং সাত্ত্বিক গুণ সোনার শিকলের মতো। নানা ধাতু দিয়ে তৈরি হওয়া সত্ত্বেও, গুণগুলি কিন্তু আসলে শিকল যে আমাদের এই সংসারে আবদ্ধ কোরে রাখে। সাত্ত্বিক গুণ ধার্মিকতা বোঝালেও আসলে একটি সোনার শিকলের মতো যা আমাদের পার্থিব সংসারের সাথে সংযুক্ত কোরে রাখে।

ঈশ্বর বলেছেন যে সাত্ত্বিক গুণ শুদ্ধ এবং আমাদের ইতিবাচক জ্ঞান প্রদান করে। সপ্তদশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন, 'সত্ত্ব সঞ্জয়তে জ্ঞানম' যেখানে তিনি স্পষ্টভাবে বুঝিয়েছেন যে সাধুচরিত্র এবং ধার্মিকতা থেকে উৎপন্ন হয় জ্ঞান। কিন্তু, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ যে জ্ঞান অর্জন করে তা হলো অস্থায়ী বৈজ্ঞানিক জ্ঞান।

এই জ্ঞান মানুষকে সম্ভবত সুখের দিকে চালিত করতে পারে কারণ এটি শুদ্ধ জ্ঞান যা সাধুচরিত্র এবং সাধু ভাবে জীবনযাপন থেকে আসে। একবার অনুভব করার পর, মানুষ এই সুখকে বারবার অনুভব করার আখাঙ্খা রাখে। এর ফলে তারা এই সুখের প্রতি আসক্ত হয়ে পরে এবং সুখের বন্ধনে বাঁধা পরে যায়। সাত্ত্বিক গুণের দ্বারা অর্জিত সুখ সসীম এবং পরমাত্মার সাথে মিলনের মাধ্যমে পাওয়া অসীম সুখের তুলনায় খুবই সীমিত।

যারা সত্যিকার অর্থে গুণের স্বরূপ বুঝতে পেরেছেন, তারা কখনও কখনও তাদের অর্জিত জ্ঞান সম্পর্কে অভিমান এবং অহংকার বোধ করেন। আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন যারা গীতাব্রতী এবং গীতার সাতশো শ্লোক শুদ্ধ উচ্চারণ সহযোগে পাঠ করতে পারেন। স্বভাবতই তারা তাদের এই জ্ঞানের জন্য গর্ব বোধ করতে পারেন। এই গর্বকে সাত্ত্বিক অভিমান বলা যেতে পারে কারণ এটি ভগবদ্গীতা শিক্ষার মতো সুকর্ম থেকে উৎপন্ন। সাত্ত্বিক হওয়া সত্ত্বেও, এই

অভিমান আমাদের অহংকারে আবদ্ধ করে এবং অবশেষে দুঃখের কারণ হতে পারে।

তাই এই ধরনের অহঙ্কার যাতে আমাদের মধ্যে গড়ে না ওঠে, সেজন্য আমাদের সর্বদা সচেতন ও সতর্ক থাকতে হবে। পরম পূজ্য স্বামীজী আমাদের মধ্যে অহংকার বিকাশ যাতে না হয়ে, তার জন্য সর্বদা সজাগ থাকতে এবং এই ধরনের আবেগ মনে আসলে তাকে দ্রুত ধ্বংস করার পরামর্শ দিয়েছেন। যদি কখনও আমরা আমাদের মধ্যে এই ধরনের আবেগ দেখি, আমাদের তখন উচিৎ সেটি স্বীকার করা। আমরা যখন আমাদের এই নেতিবাচক অনুভূতিকে স্বীকার করবো তখনি আমরা তাকে নির্মূল করতে স্বচেষ্ট
হয়ে উঠতে পারবো।

অহংকার ও অভিমানের মতো ক্ষতিকারক আবেগের বিনাশ মন্দিরে গিয়ে ভগবানের আরাধনা করে এবং নিত্য পূজা করে অর্জন করা যায়।

জ্ঞান বন্ধনের উৎস হয়ে ওঠার একটি সুন্দর উদাহরণ হল উপনিষদে শ্বেতকেতুর গল্প। শ্বেতকেতু, তার শিক্ষা সমাপ্ত করার পর, গুরুকুল থেকে অহংকারী প্রত্যয় নিয়ে তার পিতার
কাছে ফিরে আসেন। সে মনে করেন যে এই পৃথিবীতে যা কিছু জানার তিনি সেই সমস্ত জ্ঞান আয়ত্ত করেছেন।

তার পিতা শ্বেতকেতুর মধ্যে এই অহং আবেগ লক্ষ্য করেন এবং তাকে ব্রাহ্ম বিদ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। তিনি বললেন, “ইয়েনাশ্রুতম শ্রুতম্ ভবতি, আমতম মাতম, আভিজ্ঞতাম জ্ঞানতম ইতি" অর্থাৎ তুমি কি কখনও সেই জ্ঞানের সন্ধান করেছ যার দ্বারা অশ্রুত শোনা যায়, অদেখা দেখা যায়, অজানাকে জানা যায়?

পিতার এই প্রশ্ন শুনে শ্বেতকেতু কোন উত্তর দিতে পারে না কারণ তার কাছে সেই জ্ঞান অজানা ছিল। যদিও তার সত্ত্বিক গুণ শ্বেতকেতুকে গুরুকুলে ভালোভাবে অধ্যয়ন করতে উৎসাহিত করেছিল, কিন্তু সেই গুণ তাকে সাত্ত্বিক অহংকারের পথেও পরিচালিত করেছিল । আমরা যদি এই ধরনের নেতিবাচক আবেগকে ধ্বংস করতে সতর্ক না হই, তাহলে তা আমাদের সমস্ত সাধনাকে ধ্বংস করে দেবার ক্ষমতা রাখে।

বিবেচন সভার শেষে সাধকদের কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়ে এবং ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা এবং হনুমান চালিসা পাঠের মাধ্যমে সভা সমাপ্ত হয়।

:: প্রশ্নোত্তর ::

প্রিয়াঙ্কা আচপাল মহাশয়া

প্রশ্ন: আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, আমরা কখনও কখনও না বুঝেও অন্যকে আঘাত করে থাকি, দুঃখ দিয়ে থাকি। এটি যাতে না হয়ে আমরা কিভাবে সতর্ক হতে পারি? এছাড়া, আমরা যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে কাউকে আঘাত করি, আমরা কি সেই আঘাতের জন্য দায়ী হতে পারি?

উত্তর: চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা সবসময় সতর্ক নাও থাকতে পারি। আমাদের কর্ম বা কথা অন্য ব্যক্তির উপর কী প্রভাব ফেলেছে সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। যদি আমাদের উদ্দেশ্য বেদনা প্রদান না করা হয়, এবং তা আমরা অজ্ঞানে করে ফেলি তা হলে আর কিছু করার নেই । এটি রাজসিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে প্রায়ই ঘটে কারণ তারা অত্যন্ত উৎসাহী এবং তাদের কর্ম সম্পর্কে উত্তেজিত থাকেন। তারা বুঝতে পারেন না যে তাদের কর্ম এবং বাক্য অন্যের দুঃখের কারণ হতে পারে। ভগবদগীতার ষষ্ট এবং সপ্তদশ অধ্যায়ে, ভগবান আমাদের এই ধরণের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করার কিছু উপায়ে বলেছেন, যা অনুসরণ করলে আমরা সাত্ত্বিক ব্যক্তিত্ব পেতে সক্ষম হতে পারি। পথটি সহজ নয় এবং প্রখর অনুশীলন এবং দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ।

আমাদের বিশ্বাস যে আপনার এই বিবেচনাটি পড়ে ভালো লেগেছে। দয়া করে নিম্নে দেওয়া লিঙ্কটি ব্যবহার করে আপনার মূল্যবান মতামত দিন -

https://vivechan.learngeeta.com/feedback/

বিবেচন সারটি পড়ার জন্য, অনেক ধন্যবাদ!
আমরা সকল গীতা সেবী, এক অতুলনীয় প্রত্যাশা নিয়ে, বিবেচনের অংশগুলি বিশুদ্ধ ভাবে আপনার কাছে পৌঁছনোর প্রচেষ্টা রাখি। কোনো বানান বা ভাষারগত ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

জয় শ্রীকৃষ্ণ!
সংকলন: গীতাপরিবার – রচনাত্মক লেখন বিভাগ

প্রতি ঘরে গীতা, প্রতি হাতে গীতা!!
Let's come together with the motto of Geeta Pariwar, and gift our Geeta Classes to all our Family, friends & acquaintances

https://gift.learngeeta.com/

গীতা পরিবার একটি নতুন উদ্যোগ নিয়েছে। এখন আপনি পূর্বে পরিচালিত সমস্ত ব্যাখ্যার (বিবেচনের) ইউটিউব ভিডিও দেখতে পারেন এবং PDF পড়তে পারেন। অনুগ্রহ করে নিচের লিঙ্কটি ব্যবহার করুন।

https://vivechan.learngeeta.com/

|| গীতা পড়ুন, পড়ান ,জীবনে গ্রহণ করুন ||
|| ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ||